কবিতা-ই ছিল তাঁর চৈতন্যের ঘর-বাড়ি

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

শামসুর রাহমান, সন্দেহ নেই ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার সবচেয়ে নন্দিত পুরুষ। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুধীন দত্তরা রবীন্দ্রনাথকে ভেঙেচুড়ে বাংলা কবিতার যে নতুন সড়ক নির্মাণ করেছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে সে পথেই হেঁটেছেন শামসুর রাহমান। যে পথ মাড়াতে দীর্ঘদিন ইতস্তত করছিলেন জীবনানন্দ দাশ, যে পথে পা বাড়াননি জসীমউদদীনের মতো বড় কবি এবং কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন আহসান হাবীবও। এই অচেনা সড়কের দু'পাশে একমাত্র শামসুর রাহমানই বিনা দ্বিধায় রোপন করেছেন সবুজ গাছ-লতা। সেইসব গাছে গাছে এখন অসংখ্য পাখির কূজন। পাখির কলকাকলিতে আমাদের ঘুম ভাঙে প্রতিদিন ভোরে। আধুনিক বাংলা কবিতার ব্যস্ততম মহাসড়কের দু'পাশে আজ যে নয়নাভিরাম সবুজ বনানী গড়ে উঠেছে এটা শামসুর রাহমানেরই কৃতিত্ব। তারই সৃষ্টি।

আমাদের ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে শামসুর রাহমানের কোন কবিতা ছিল না। জীবিত কবিদের মধ্যে কেবল, যতদূর মনে পড়ে, জসীমউদদীনের কবিতা পড়েছিলাম। 'নিমন্ত্রণ' ছিল মোটামুটি একটি কমন কবিতা। হাইস্কুলের শুরু থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় সব ক্লাসেই এই কবিতাটি আমরা পড়েছি। স্পস্ট মনে আছে আমি কোন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকেই অন্তমিল বর্জিত কোন কবিতা পড়িনি। অন্তমিল ছাড়াও যে কবিতা হয় এইটা বুঝতে বোধকরি আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিদেরও সময় লেগেছিল প্রায় অর্ধ-শতাব্দী। শামসুর রাহমানের মতো বড় কবিকেও পঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আর এই অন্তর্ভূক্তির লোভে তিনি কখনোই পেছন ফিরে তাকাননি। অনুসরণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা জসীম উদদীনের পদাঙ্ক। আধুনিক কবিতার যে বিশুদ্ধ আঙ্গিক তিনি রপ্ত করেছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হননি কখনোই। আমৃত্যু তিনি সে পথেই হেঁটেছেন। এরশাদের শাসনামলেই সম্ভবত সর্বপ্রথম, আশির দশকের গোড়ার দিকে, স্কুল কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক কবিতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তখনই সারা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকের সাথে ব্যাপক পরিচয় ঘটে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান ও ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতার। যখন স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্ত হতে শুরু করে, *'স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান। স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা-'* মূলত তখনই এ দেশের শিল্পরসিক মানুষ টের পায় অধুনিক কবিতার শক্তি। গণমানুষের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার যেটুকু আত্মীয়তা, যেটুকু যোগাযোগ, তাও শামসুর রাহমানেরই অবদান।

তার সমস্ত কবিতার মূল সুরটিই হলো দেশপ্রেম। শামসুর রাহমান কখনোই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। এমন একটি সামাজিক ইস্যু নেই যেটি তাকে স্পর্শ করেনি, যা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেননি। 'আসাদের শার্ট', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' যেমন আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক বড় ইস্যুর ওপর লেখা তেমনি তার অসংখ্য কবিতা আছে যেগুলি ছোট ছোট সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলনের ওপর লেখা। একজন বিপ্লবীর স্ত্রী'র পায়ে পায়ে হাঁটে শঙ্কা, অমঙ্গলের আশঙ্কায় বারবার কেঁপে ওঠে বুক। সেই শঙ্কার ধুকপুকানি প্রতিধ্বণিত হয় তার কবিতায়।

> 'ওগো তুমি আর ওসব ঝুটঝামেলায় যেও না
> আমার বড় ভয় করে। কী দরকার

এক হাঁটু ধুলো ভেঙে
অজ পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়াবার না খেয়ে, আধপেটা
খেয়ে? খামোকা গলির মোড়ে মোড়ে
লোকদের সমাজ পাল্টাবার মন্ত্র জপিয়ে অথবা
সরকার বদলের ডাক দিয়ে
নিজেরই বিপদ ডেকে আনবার কী দরকার?

--------ওলো তোমার পয়ে পড়ি,
আর তুমি যেও না মিটিং-এ মিছিলে,'
(রাত দেড়টায়, কাব্যগ্রন্থ: টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে)

আশির দশকের মাঝামাঝি এক সময়। ফেব্রুয়ারী মাস। বইমেলার মাস। গুলশান থেকে বাদুড়ঝোলা হয়ে ৬ নম্বর বাস ধরে আসি ফার্মগেইট। সেখান থেকে আরেক বাসে শাহবাগ। তারপর হাঁটা। সে-কি এক উন্মাদনা। মেলায় যাবো। বই কিনবো। কার বই কিনবো? কার আবার, শামসুর রাহমানের। বইয়ের নাম *'অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই'*। এই প্রথম আমি শামসুর রাহমানের বই কিনি। প্রতিটি কবিতা বারবার পড়ি, বহুবার পড়ি। পড়তে পড়তে মুখস্ত করে ফেলি।

তখন থেকেই শামসুর রাহমানের কবিতার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু তাকে জানতে হলে পেছনের কবিতাগুলোও যে পড়তে হবে। পড়তে শুরু করি,

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
(তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা)

স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার
স্বাধীনতা তুমি

মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক
(স্বাধীনতা তুমি)

পড়ি আর শিহরিত হই। নজরুলের পড়ে আর কে লিখেছে এমন শক্ত দেশের পঙক্তি? একবার কবি, ছড়াকার ফয়েজ আহমদ এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'শামসুর রাহমানকে বলেছিলাম, আসাদের শার্টের মতো কবিতা লিখতে। এর পরে যা লিখেছে তা আর স্পর্শ করে না।' হয়ত ফয়েজ ভাই *'আসাদের শার্ট'* কবিতাটিতে বড় বেশী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বলেই ওটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। আসাদের রক্তাক্ত শার্ট যেমন হয়ে উঠেছিল তখন আন্দোলনের অবধারিত মেনিফেস্ট, 'আমাদের প্রাণের পতাকা' ঠিক তেমনি আমদের চেতনায় আসাদের শার্ট গেঁথে দিয়েছেন কবি শামসুর রাহমান এই কবিতাটি রচনা করে। আসাদের শার্ট এখন বাঙালী জাতীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমোশোনাল এবং ইন্টেলেকচুয়াল রিসোর্স।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
        শহরের প্রধান সড়কে
        কারখানার চিমনি-চূড়োয়
        গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
(আসাদের শার্ট)

১৯৯৯ সালে হঠাৎ এক মৌন সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হই কবির শ্যামলীর বাসভবনে। সাথে ছিলেন বগুড়ার কবি ফিরোজ আহমদ। এমন সুপুরুষ আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। কি অমায়িক ব্যবহার। নানান অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে কিন্তু এমন ঘরোয়া পরিবেশে কবি শামসুর রাহমানের সাথে আর কখনোই আমার আলাপ হয়নি। আমি নুয়ে পড়ে তার পা ছুঁয়ে সালাম করি। এই কাজটি আমি সাধারণত করি না। কিন্তু এই মানুষটির অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে আমার মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এলো। কবিতা নিয়ে কিছু কথা হলো। মূলত তরুণদের কবিতা নিয়ে তার কি ভাবনা এই বিষয়েই বেশী কথা-বার্তা হলো। তিনি তরুণদের কবিতা সম্পর্কে বেশ আশাবাদ ব্যক্ত করলেও তেমন উচ্ছাস প্রকাশ করলেন না। সাধারণত শামসুর রাহমান কখনোই কোনো বিষয়ে খুব উচ্ছসিত হতেন না। কিংবা তার উচ্ছাস বোঝা যেত না। এর ক'দিন আগেই রামপুরার এক ছেলে (কোন একটি মৌলবাদী দলের সদস্য) তাকে হত্যা করতে তার বাসায় যায়। ভেবেছিলাম তিনি এতে বিচলিত এবং কারো সঙ্গে কথা বলতে বিব্রত হবেন হয়ত। কিন্তু তার আচরণে বিব্রতবোধের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। চা এলো, বিস্কুট এলো। আমরা একসঙ্গে চা খেলাম। আমি তাকে আমন্ত্রণ জানালাম আমার সম্পাদিত পত্রিকা *'কাজীর কাগজ'*-এর প্রথম সংখ্যাটির মোড়ক উনমোচন করার জন্য। তিনি স্বানন্দে রাজী হলেন।

১৩ মার্চ ১৯৯৯। সকাল দশটা। বিশ্ব-সাহিত্য কেন্দ্রের ছোট্ট অডিটোরিয়ামটি লেখক-কবিদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ। ভাবতেই পারিনি এতো লেখক-কবির সমাগম হবে। আজ কবি আনওয়ার আহমদের ৫৮-তম জন্মদিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রূপম, কিছুধ্বনি-র সম্পাদক ও কবি আনওয়ার আহমদ আজ আর বেঁচে নেই। আমি *'কাজীর কাগজ'*-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলাম আনওয়ার আহমদের ওপর। দেশের প্রায় সব খ্যাতিমান লেখক-কবিই সেই সংকলনে লিখেছিলেন। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন আসবেন তিনি। আমাদের পথ প্রদর্শক। কবি শামসুর রাহমান। যেহেতু অনুষ্ঠানটির আয়োজক *'কাজীর কাগজ'*, কাজেই আমি ব্যস্ত এর সকল আয়োজনের তদারকিতে। এক পর্যায়ে আনওয়ার ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, এতো লোক কিভাবে এলো? আনওয়ার ভাই তার চিরাচরিত ঝাঝালো গলায় বললেন, খবরতো রাখো না। ১৩টা কাগজে নিউজ এসছে। তখনি ফিরোজ আহমদ কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করলাম। মঞ্চে পশাপাশি বসা কবি শামসুর রাহমান, কবি কায়সুল হক, কবি আনওয়ার আহমদ, শিল্পী বীরেন সোম ও আমি। অনুষ্ঠান শুরু হলো কবি শামসুর রাহমানের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও কাজীর কাগজের মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। তিনি আনওয়ার আহমদের দীর্ঘজীবন কামনার পাশাপাশি সম্পাদক হিসাবে তার সাফল্যের কথা বললেন। কবি আনওয়ার আহমদ সম্পর্কে বললেন, *'একসময় মনে হয়েছিল আনওয়ার কবিতা লিখতে পারবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও কবি হয়ে উঠেছে'*। আহমদ ছফা অডিটোরিয়ামের দরোজা পর্যন্ত এসে আবার এবাউট টার্ন করে চলে গেলেন। আমি কানে কানে আমার পাশে বসা আনওয়ার ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, শামসুর রাহমানের সাথে সমস্যা আছে। একে একে প্রায় ২৫জন লেখক কবি বক্তৃতা করলেন। সবশেষে ফিরোজ আহমদ যখন আমার নাম ঘোষণা করলেন, আমি উঠে মাইকের সামনে গিয়ে কবি শামসুর রাহমানকে দ্বিতীয়বারের মতো বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানালাম। এতে তিনি কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন বলে মনে হলো। ইতস্তত করতে করতে তিনি উঠলেন এবং মাইকের সামনে গিয়ে হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, *'আমি এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছি কাজীর কাগজের সম্পাদক আমাকে কেন দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আসলে আমার একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। আমি প্রথমবার সদ্য প্রকাশিত এই কাগজটি সম্পর্কে কিছুই বলিনি। সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাকে ভুলটি সংশোধনের সুযোগ করে দেবার জন্য।'* এরপর তিনি কাজীর কাগজ সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেন। মূলত প্রশংসাই করেন। এবং তিনি এ-ও বলেন, *'এটি একটি ইতিহাস। এর আগে আমি আর কখনোই দেখিনি একজন কবির জন্মদিনে একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছে।'*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে / সহজ কথা যায় না বলা সহজে। কবি শামসুর রাহমান সেই সহজ কথার, সহজ শব্দাবলীর এক দক্ষ কারিগড় হয়ে উঠেছিলেন খুব কম বয়সেই। অত্যন্ত সহজ শব্দাবলীতে তিনি অবিরাম পয়ার রচনার এক দূর্লভ কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিলেন। তাকে যতোবার, যে অবস্থাতেই দেখেছি সবসময়ই মনে হয়েছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে আছেন। সেই ঘোর কবিতার ঘোর। কবিতা-ই ছিল তার চৈতন্যের ঘর-বাড়ি। তাকে কখনোই কবি ছাড়া আর অন্য কোন কিছু মনে হয় নি। যখনই দেখি মনে হয় তিনি সেই অমিয় ঘোরের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কাব্যদেবী তার রেশমী শুভ্র চুলে বিলি কাটছে। তিনি এক্ষুণি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়বেন। বাংলা সাহিত্যে যোগ হবে আরো একটি অসাধারণ কবিতা। তার চিন্তার বাগানে কবিতা ছাড়া আর অন্য কোন স্বপ্নের বীজ প্রোথিত হয়নি।

যদি বাঁচি চার দশকের বেশি
লিখবো

যদি বাঁচি দুই দশকের বেশি
লিখবো
যদি বেঁচে যাই একটি দশক
লিখবো
যদি বেঁচে যাই দু চার বছর
লিখবো
যদি বেঁচে যাই একটি বছর
লিখবো
যদি বেঁচে যাই একমাস কাল
লিখবো
যদি বেঁচে যাই একটি দিন আরো
লিখবো।
(ইচ্ছা)

তার অন্তিম ইচ্ছাটিও এটিই ছিল। আরো একটি পঙক্তি রচনার ইচ্ছা। অন্তিম শয়ানেও তিনি মাঝে-মাঝেই অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলতে চাইতেন। ইশারায় কাগজ-কলম চাইতেন রোগশয্যাপাশে শুশ্রূষারত প্রিয়জনদের কাছে কবিতা লিখবার জন্য। শামসুর রাহমানের কবিতা আমাদের জন্য বিশ্বভ্রমণের একটি বিস্তৃত জানালা খুলে দেয়। আমরা ঘুরে আসতে পারি লোর্কার স্পেন, আরব্যরজনীর মরুদ্যানসহ সমগ্র বিশ্ব।

হন্তারক গুলিবিদ্ধ হিস্পানি প্রান্তরে পড়ে-থাকা
লোর্কা, তার কবিতার পঙক্তিমালা স্তব্ধ মধ্যরাতে
মাথার ভেতরে ডালিমের দানার মতো লাল,
হলদে, চকোলেট,
ফিরোজা, বেগুনি গুঞ্জরণ; যেন কেউ কি বিভোর
বাজিয়ে চলেছে এক চন্দ্রিল সিম্ফনি

তরুণীর শরীরের দিলরুবা আর মরুদ্যানের হাওয়ার
ধ্বনি, ঠোঁটে কিছু
স্বপ্নকণা ঝরে, ব্লাউজের বেড়া টপকিয়ে বের
হয়ে আসে স্বপ্নভ্রস্টতায়
যমজ চাঁদের মতো স্তন

অগ্নি গোলকের মতো
ষাঁড়, বুকে গোলাপ-প্রোথিত মাতাদোর, বৃষ্টিপায়ী
স্তব্ধ ঠোঁটে মৃত্যুর প্রসূন, কাসিদার
স্মৃতি নিয়ে চলেছেন হেঁটে বড় একা

কে যায় একাকী চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত পোজে
খাবি খায় নর্দমায়, মনিরত্ন খোঁজে?
আমিওতো মাঝে মাঝে
উড়িয়ে মেঘের তুলো ঠুকরে ঠুকরে পথ চলি
জলাঞ্জলি দিয়ে ভব্যতার নিল ভোকাট্টা নিশান।
(ঘুমুতে যাবার আগে, কাব্যগ্রন্থ: স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার)

সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যখনই কবির চেতনায় উদিত হয় অন্তিম শয়ানের কথা, তখনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো মস্তিস্কের কোষে কোষে জ্বলে ওঠে স্বদেশের মুখ না দেখে প্রস্থানের আক্ষেপ। *'ঘুমুতে যাবার আগে'* কবিতায় তাই তিনি বলেন--

যদি মৃত্যু আমার সত্তার তন্তুজালে
সকালে ফলিয়ে যায় নিরুত্তর হিম, তবে আমি
রোদ্দুরের রেণুমাখা ডুমুর গাছের পাতা, ডালে দোল-খাওয়া
পাখি দেখবো না আর; এবং যেসব
কবিতার, দর্শনের বই কিনে সাজিয়ে রেখেছি
থরে থরে বুক-শেলফে, সেগুলো হবে না পড়া আর
কোনোদিন, যার মুখ বার বার দেখেও মেটে না
দৃষ্টি-তৃষ্ণা, তার
মুখশ্রী অদৃশ্য হবে আবছায়া হয়ে চিরদিনকার মতো।

আমরা স্পস্টতই বুঝতে পারি যে মুখ না দেখে তিনি মরতে চান না, সেই প্রিয় মুখের নাম বাংলাদেশ, কবির প্রিয়তম স্বদেশ। এভাবেই কবি শামসুর রাহমান বার বার, হাজার বার জানান দিয়েছেন তার কবিতার শব্দের হৃদয়ে প্রোথিত দেশপ্রেমের চিরায়ত-শাশ্বত বাণী। কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জাতীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই বলেছেন, কবি শামসুর রাহমান আমাদের স্বাধীনতার কবি। শামসুর রাহমান শুধু সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুর ওপর কবিতা লিখে চুপচাপ বসে থাকেননি, প্রতিটি চলমান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দিয়েছেন সবসময়ই। এইখানেই কবি শামসুর রাহমান আর সকলের চেয়ে আলাদা। আর তখনই তিনি হয়ে যান আমাদের হৃদয়ের কবি, আমাদের প্রাণের মানুষ। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করি, তিনি আমাদেরই একজন।

কবি শামসুর রাহমান ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, কল্পনায়, বাস্তবে। যখন যেখানেই গিয়েছেন, থেকেছেন, পাঁচতারা হোটেলের আয়েশী ফোমের বিছানায় শুয়ে বিদেশের সকল সুখ-সৌন্দর্য ছাপিয়ে তার মানষপটে কেবলই ভেসে উঠেছে স্বদেশের প্রিয়তম মুখ। এক দন্ডের জন্যেও বিস্মৃত হয়নি প্রিয়তম বাংলাদেশের মুখশ্রী। কলকাতায় বসে তিনি লিখছেন--

মাইরি, এ মধ্যবয়সের গোধূলিতে
কী পেলে গঙ্গার ধারে, বিকেলের চৌরঙ্গীর ভিড়ে?

কলকাতার কণ্ঠে মদির ছেনালি,
যেন তার গলার ভেতর
থেকে এক কামবিদ্ধা বিড়ালিনী কিছু ধ্বনি
মসৃণ উগড়ে দিচ্ছে। বুঝি
আমার সত্তার গহনতা
থেকে উঠে-আসা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা
এবং মেঘনার তীব্র ঘ্রাণ,
দোয়েলের শিস, কলাপাতা শাপলার হুটোপুটি তার
ক্ষয়াটে বর্তুল ফোমে-গড়া স্তনে ভিন্ন শিহরন
জাগাল আবার।
(দুর থেকে তোমার নিকট, কাব্যগ্রন্থ: স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার)

১৯৯০ এর ডিসেম্বর। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। স্বৈরাচারের পতন এবার অনিবার্য। ছাত্র-জনতা, নারী-পুরুষ, শিশু-যুবা সবাই নেমে এসেছে রাজপথে। ওই যে দেখা যায় ক্যামোফ্লেজে ঢাকা এক স্বৈরপ্রাসাদ। ওখানেই বন্দী আমাদের প্রাণের স্বদেশ, প্রিয়তম গণতন্ত্র। অন্ধকার ব্যারাকের ভেতর থেকে গণতন্ত্রকে বের করে আনতে হবে খোলা আকাশের নিচে, কোটি জনতার মঞ্চে।

'সারারাত নূর হোসেনের চোখে এক ফোঁটা ঘুমও / শিশিরের মতো / জমেনি। ....কাল রাত ঢাকা ছিল প্রেতের নগরী, / সবাই ফিরেছে ঘরে সাত তাড়াতাড়ি। চতুর্দিকে / নিস্তব্ধতা ওৎ পেতে থাকে, ছায়ার ভেতরে ছায়া, আতঙ্ক একটি / কৃষ্ণাঙ্গ চাদরে মুড়ে দিয়েছে শহরটিকে আপাদমস্তক। ....এমন সকাল তার জীবনে আসেনি কোনদিন, / মনে হয় ওর; জানালার কাছে পাখি / এ রকম সুর / দেয়নি ঝরিয়ে এর আগে, ডালিমের / গাছে পাতাগুলো আগে এমন সতেজ / হয়নি কখনো মনে। জীবনানন্দের / কবিতায় মায়াবী আঙুল / তার মনে বিলি কেটে দেয়। অপরূপ সূর্যোদয়, / কেমন আলাদা, / সবার অলক্ষ্যে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে/ আঁকা হয়ে যায়, / যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গণে।

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে / রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান, / বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ / শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা / নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয় / ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ / বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার / বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।' (বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, কাব্যগ্রন্থ: বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়)

এভাবেই শামসুর রাহমান প্রতিটি চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে যান। নব্বুইয়ের গণ-আন্দোলনের প্রাণ শহীদ নূর হোসেনের মায়ের শোকার্তিও বাদ যায়নি তাঁর কাব্যভাবনা থেকে।

সময় কাটতো ওর রাশি রাশি বই পড়ে, খুব
রাত করে ঘুমোতো সে, কখনো কখনো
কণ্ঠে ওর নক্ষত্রের মতো
ফুটতো কী সব কথা, যা ছিল আমার
বোধের ওপারে। বলতো সে

মাঝে মাঝে, রাতে স্বপ্নে দেখি
ফুটেছে গোলাপ এক বুকের ভেতরে
মা, তোমার মমতার মতো। তোমার মুখেই দেখি
প্রতিদিন স্বদেশের মুখ এবং যখন তুমি
ঘর ঝাট দাও, ভাবি সরাচ্ছো জঞ্জাল এ দেশের।
(একজন শহীদের মা বলছেন, কাব্যগ্রন্থ: বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়)

আমৃত্যু তিনি কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন দুই হাতে। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এতো অধিক সংখ্যক কবিতা লিখতে গিয়েই হয়ত কিছু শব্দ তার নিজস্ব হয়ে যায়। এমনটি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, জসীম উদদীন, সকলেরই হয়েছিল। যে শব্দগুলো ঘুরে ফিরে বার বারই কবিতায় এসেছে। যেমন রোদ্দুর, করোটি, চৌদিকে, ডালিমের, ফালি এ জাতীয় শব্দগুলো শুনলেই আমরা বুঝি এটা শামসুর রাহমানের কবিতা। কিছু বিশেষ শব্দের প্রতি একজন কবির দূর্বলতা থাকতেই পারে। সেই সব শব্দের পূনরাবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন *'রিসিভার্স অব স্টোলেন প্রোপার্টি,'* আজকের কাব্যবোদ্ধাদের অনেকেই মনে করেন এটিই একজন কবির স্বকীয়তা।

১৩ মার্চ ১৯৯৯। সেদিন দুপুরে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম *'কাজীর কাগজ'*-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে কবি শামসুর রাহমানের ওপর। পরদিন বিভিন্ন কাগজে তা নিউজ-ও হয়েছিল। কিন্তু পেশাগত ব্যস্ততা এবং এক বছরের মাথায় দ্বিতীয়বারের মতো (এবং দ্বিতীয়বার লম্বা সময়ের জন্য) বিদেশ যাত্রা, এসব কারণে সেই ঘোষিত সংখ্যাটি আজও বের হয়নি। আবিদজানে বসে যখন শামসুর রাহমানের মৃত্যু-সংবাদ শুনি, ভাতের প্লেটে হাত রেখে ঢুকরে কেঁদে উঠি আমি । আমার গলা দিয়ে খাবার নামছে না। আবিদজানের বাতাশ আমার কাছে ক্রমশই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। স্ত্রী আমার পিঠে হাত রেখে বলেন, কি হয়েছে? আমি বলি, কথা রাখতে পারলাম না। প্রবাস জীবন আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে আবার কেড়েও নিয়েছে তার চেয়েও বেশি। কাজীর কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যা হয়ত বেরুবে এবং সেটা শামসুর রাহমান সংখ্যা-ই হবে কিন্তু সেদিন হয়ত আমি আরো একবার কাঁদবো।

আমিতো আর কোনোদিন পত্রিকাটি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারবো না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬